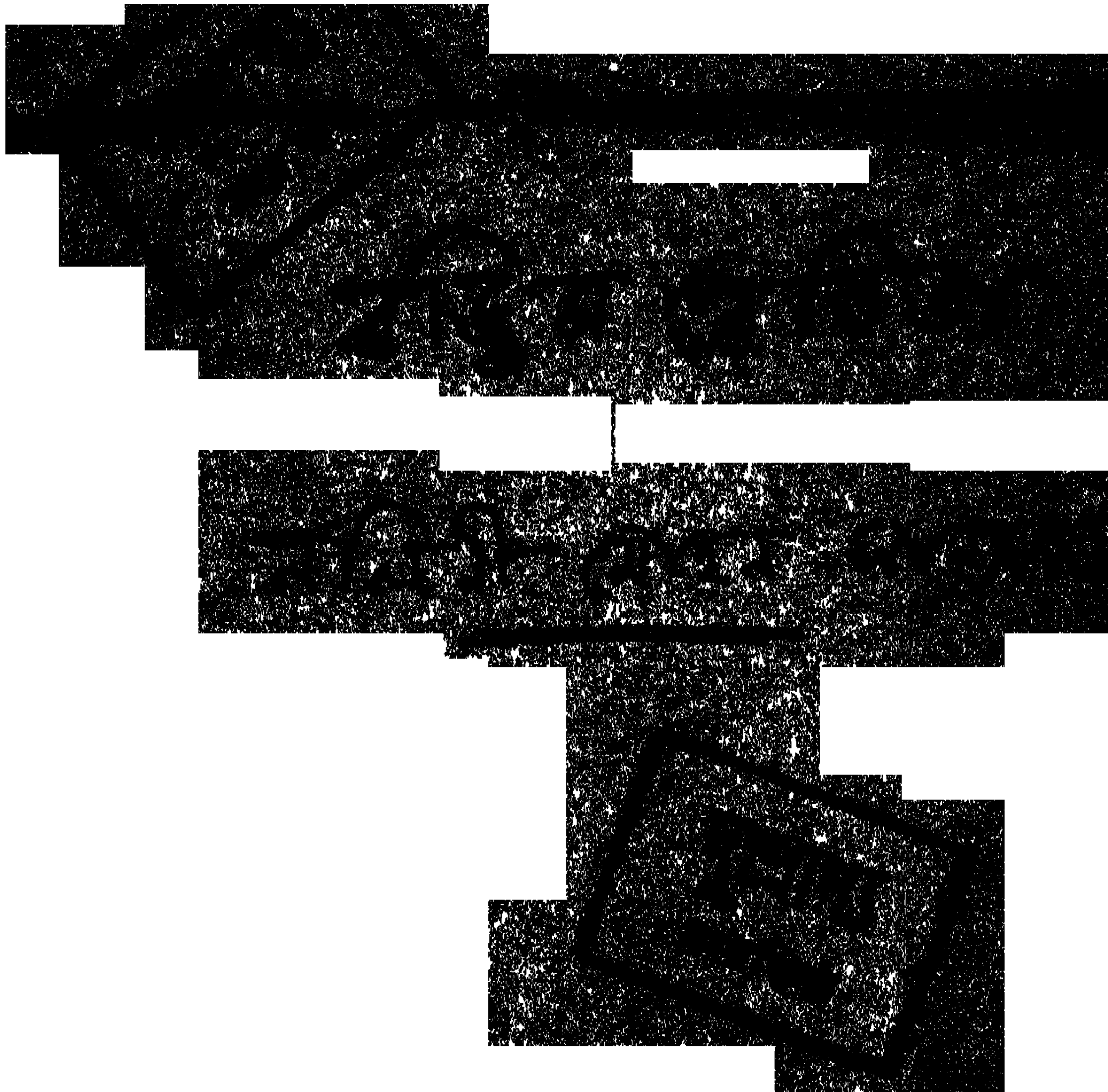


বঙ্কিম-প্রতিভা

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন।

প্রকাশক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক
বাঙ্গালী বুক ডিপো
১৬নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা।

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬

প্রিন্টার—শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—চারি আনা মাত্র।

বঙ্কিম-স্মরণে

সাহিত্য-কাননে যবে ফুটে[illegible] ফুল,
উঠে নাই [illegible]-ঝঙ্কার,
অরুণ-উদয়-লেখা পূর্বাশার ভালে
লিখে নাই জ্যোতির লিপিকা,
পুঞ্জিত তমিস্রা নাশি' জ্বালাইলে তুমি
ভারতীর আরতি-দীপিকা;
রেখে গেলে বর্ণরাগ অক্ষয় রেখায়
উজলিয়া কালের ভাণ্ডার!
বাণীকুঞ্জে ভ্রমরবে করিলে আহ্বান
প্রভাতের অরুণ আলোক,
ফুটায়ে বিচিত্র পুষ্প প্রতিভা-প্রভায়
বিরচিলে পূজার আসন।
অনাগত বসন্তের তুমি অগ্রদূত;
নিখিলের ধ্যানের স্বপন[illegible]
তরঙ্গিত, হে বঙ্কিম, সৃষ্টিমাঝে [illegible]
পরিপূর্ণ প্রাণের পুলকে;
মৌন কণ্ঠে ফুটায়েছ ভাষার কাকলী,
কাব্যছন্দে দুলায়েছ 'কথা',

মনের গহন-তলে ছিল লীন যত
হাসি-অশ্রু-প্রেম-ভালবাসা
দেছ রূপ তাহাদের, প্রাণ অভিনব ;
মিটায়েছ অতৃপ্ত পিপাসা !
শিখায়েছ মাতৃপূজা—'বন্দেমাতরম্'—
অর্ঘ্য[illegible]ার তীব্র আকুলতা !
সারদার মন্দিরের জীর্ণ সরণি
তব মন্ত্রে হ'ল রাজপথ ;
চলিয়াছে কত ব্রতী সেই পথ ধরি'
সাথে লয়ে দিব্য উপচার ;
বাঁধিয়াছ বর্ত্তমানে ভাবিকাল সাথে ;
ভবিষ্যের অদৃশ্য দুয়ার
মুক্ত আজি, হে বঙ্কিম, তব সাধনায় ;
পূর্ণ আজি সব মনোরথ !
আরতি-বাসরে আজি লহ, দেব, মম
ভক্তিনত, কুণ্ঠিত প্রণতি ;
অনাদি কালের কবি, তব দীপ্ত বাণী
পূরাইবে সব ক্ষয়-ক্ষতি ! *

* লেখকের মধ্যম পুত্র সুকবি অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্‌-এ রচিত।

বঙ্কিম-প্রতিভা

যে মনীষিগণ হইতে একালের বঙ্গবাসিগণ জাগরণের অন্যতম প্রেরণা পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম রাজা রামমোহন রায়, দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং তৃতীয় স্বামী বিবেকানন্দ। স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি আখ্যা দিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, ঋষির জীবনে অসাধারণ পুণ্যাচার, বা চরিত্রে আদর্শ সৌন্দর্য, নাও লক্ষিত হইতে পারে, তাঁহার গৌরব তাঁহার জীবনে নহে; পরন্তু তিনি যে ভাব অভিব্যক্ত করেন সেই ভাবাভিব্যক্তিতে। কোনো জাতিকে বা সমগ্র মানবসমাজকে যে কথা জানাইতে হয়, ভগবান তাহা ঋষিমুখে ব্যক্ত করান। মানবকে যদি কোনো অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষির নয়নে সে দৃশ্য প্রতিভাত হয়। যিনি যে সত্য বা মন্ত্র জগতে প্রকাশ করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি।

এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। তাঁহার ঋষিত্ব তাঁহার দেশবাসীকে স্বদেশ-প্রেমধর্মে দীক্ষিত করায় এবং "বন্দেমাতরম" বীজমন্ত্র প্রণয়ন করায়।

অনেকের ধারণা যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বড় ঔপন্যাসিক ছিলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তিনি আধুনিক উপন্যাসের জনক, এবং উপন্যাস রচনা বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি রস-সাহিত্য-নির্মাতা ছাড়া আরো কিছু ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি একাধারে ছিলেন ভাষা-সংস্কারক, কবি, ঔপন্যাসিক, পরিহাস-রসিক, সমালোচক, সমাজ-সংস্কারক, স্বদেশপ্রেমিক, ঐতিহাসিক,

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ধর্মোপদেষ্টা। কোনো জাতি যখন তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা অনুভব করে, তখন তাহার হৃদয়ে যে সব নূতন ভাব, নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনার আবির্ভাব হয়, তাহাদের প্রকাশের উপযোগী ভাষা না পাইলে সে জাতির উন্নতির পথে বাধা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে তাহার অগ্রগতির উপযোগী ভাষাও গড়িয়া দিয়াছিলেন।

৩
বাল্যজীবন

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (ইং ১৮৩৮ সালের ২৬এ জুন) তারিখে চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁঠালপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্ম হয়। ঐ সালে কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণদাস পালও জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সহোদরের নাম পূর্ণচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলেজের ছাত্রেরা জুনিয়ার ও সীনিয়ার পরীক্ষা দিত। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে ১৮৫৭ সালে সীনিয়ার পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ১৮৫৩ সাল হইতে চারি বৎসর তিনি ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই তিনি কলিকাতায় যান, এবং আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, পরীক্ষা তিনমাস পরে, ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে, গৃহীত হইবে।

তেরো জন পরীক্ষার্থী ঐ পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং ঐ দুই জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইয়াছিলেন।

সে সময়ে হ্যালিডে সাহেব বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকাইয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অর্পণ করিলেন। ১৮৫৮ সালে কুড়ি বৎসর দুই মাস বয়সে ঐ পদ গ্রহণ করিয়া তিনি যশোহর গমন করেন।

এগার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়—স্ত্রীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর। যশোহরে যাইবার এক বৎসর পরেই তাঁহার ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

যে সময় তিনি হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন সে সময় "প্রভাকর"-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গদেশের সাহিত্য-সম্রাট্ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন, এবং কয়েকটী গদ্য রচনাও পাঠাইয়াছিলেন। রচনা-বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র (বঙ্কিম অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়) এবং কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারিকানাথ অধিকারী। ১৮৬০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের পুনর্বার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই—তিনটী মাত্র কন্যা ছিল।

বঙ্গদেশের নানা স্থানে বদলী হইয়া তিনি ৩৩ বৎসর ১ মাস গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৩ বৎসর বয়সে ৪০০৲ টাকা পেন্সনে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অতি প্রশংসার সহিত সরকারী চাকরী করিয়াছিলেন। উপরওয়ালাদের অন্যায় আদেশ কখনো মাথা পাতিয়া লন নাই—তেজের সহিত উচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ সকল বিবাদে তিনি কখনো ঠকেন নাই। বকল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট্‌ম্যাকটের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ সর্বজনবিদিত।

১৮৯২ সালের নববর্ষে তিনি রায়বাহাদুর হন, এবং ১৮৯৪ সালের নববর্ষে তিনি C. I. E. উপাধি পান। আড়াই বৎসর মাত্র তাঁহার পেন্সন উপভোগ করার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মৃত্যু

তিনি অকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র (ইং ১৮৯৪ সালের ৮ই বা ১০ই এপ্রিল) রবিবার, ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ঐ সালেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরলোকে প্রস্থান করেন। ইহার ২০ বৎসর পূর্বে চারিমাস ব্যবধানে ১২৮০ সালে তাঁহার বন্ধুদ্বয় মধুসূদন ও দীনবন্ধু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক জীবন

১৮৬৪ সালের মার্চ মাসে, যখন তিনি বারুইপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকসমস্ত প্রকাশিত হওয়ার ক্রম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১।	দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৭	১০।	লোকরহস্য	১৮৭০
২।	কপালকুণ্ডলা	১৮৬৭	১১।	রাধারাণী	১৮৭৫ ×
৩।	মৃণালিনী	১৮৬৯	১২।	বিজ্ঞানরহস্য	১৮৭৫
৪।	বিষবৃক্ষ	১৮৭২ ×	১৩।	কৃষ্ণকান্তের উইল	১৮৭৫ ×
৫।	ইন্দিরা	১৮৭২ ×	১৪।	বিবিধ সমালোচনা	১৮৭৬
৬।	যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭৩ ×	১৫।	রাজসিংহ	১৮৭৭ ×
৭।	চন্দ্রশেখর	১৮৭৩ ×	১৬।	কবিতা পুস্তক	১৮৭৮
৮।	কমলাকান্ত	১৮৭৩ ×	১৭।	প্রবন্ধ পুস্তক	১৮৭৯
৯।	রজনী	১৮৭৪ ×	১৮।	মুচিরাম গুড়	১৮৮১ ×

১৯।	আনন্দমঠ	১৮৮১×	২৫। ভগবদ্গীতা	১৮৮৬
২০।	দেবীচৌধুরাণী	১৮৮৩×	২৬। দেবতাতত্ত্ব	
২১।	কৃষ্ণচরিত্র	১৮৮৬		
২২।	সীতারাম	১৮৮৭		
২৩।	বিবিধ প্রবন্ধ	১৮৮৭		
২৪।	ধর্মতত্ত্ব	১৮৮৮		

× চিহ্নিত পুস্তকগুলি "বঙ্গদর্শনে" বাহির হইয়াছিল। রাজসিংহ ও দেবীচৌধুরাণী "বঙ্গদর্শনে" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই।

১২৭৯ সালের (ইং ১৮৭২ সালের) বৈশাখ মাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" নামক বাঙ্গলা মাসিক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম বৎসর উহা ভবানীপুর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পর বৎসর কাঁঠালপাড়ায় নিজবাটীতে ছাপাখানা স্থাপন করিয়া তিনি উহা বাহির করিতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মধ্যম-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীববাবু মুদ্রণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন; এবং তাঁহার পিতা যাদববাবু হিসাবাদি পরিদর্শন করিতেন। কোনো পারিবারিক কারণে ১৮৭৬ সালে ঐ পত্র হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭) সালে "বঙ্গদর্শন" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১২৯০ (ইং ১৮৮৩) সাল পর্যন্ত চলে। তখন সঞ্জীববাবু উহার সম্পাদক ছিলেন।

"বঙ্গদর্শন" উৎকৃষ্ট দরের মাসিক পত্র ছিল। উহাতে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হইত তাহা পক্ষপাতশূন্য ও মূল্যবান্। বঙ্গদর্শনের নিকটবর্তী সময়ে "বান্ধব" "আর্যদর্শন" "প্রচার" "নবজীবন" "বামাবোধিনী পত্রিকা" "সাহিত্য" "ভারতী" "সাধনা" "নব্যভারত" ও "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্র বাহির হইত।

বিদেশীয় ভাষায় বঙ্কিমের উপন্যাসের অনুবাদ

ইংরাজীতে—

	নাম	অনুবাদক	সাল
১।	কপালকুণ্ডলা	এচ, এড্ উ ফিলিপস	১৮৮৫
২।	বিষবৃক্ষ	মিসিস্ মিরিয়ম্ নাইট	১৮৮৪
৩।	কৃষ্ণকান্তের উইল	ঐ	১৮৯৫
৪।	দুর্গেশনন্দিনী	চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৯০
৫।	যুগলাঙ্গুরীয়	রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১৮৯৭
৬।	চন্দ্রশেখর	মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)	১৯০৪
৭।	আনন্দমঠ	নরেশচন্দ্র সেন	১৯০৭
৮।	দেবীচৌধুরাণী	স্বয়ং	

জার্মন ভাষায়—

১।	কপালকুণ্ডলা	প্রোফেসার ক্লেম	

আধুনিক বঙ্গভাষার পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র

যখন বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আহারে, বিহারে, অধ্যয়নে, চিন্তায়, রচনায় ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা ভাবের আদানপ্রদান ইংরাজী ভাষায় করিতে পারিলেই আরাম বোধ করিত। নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেও তখন চিঠিপত্র ইংরাজীতেই লেখা হইত—পুত্র পিতাকে, ভাই ভাইকে ইংরাজীতে পত্র লিখিত। পুস্তক ও প্রবন্ধাদির রচনাও ইংরাজীতে হইত। অপরিচিত বাঙ্গালীদের মধ্যে ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলিত। শিক্ষিত লোকেরা বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষিত লোক যোগেযাগে কোনো প্রকারে বাঙ্গলা লেখার কার্য নির্বাহ করিতেন। ইংরাজী লিখিয়া চটক দেখাইতে পারাকেই তাঁহারা পরমার্থ বিবেচনা করিতেন। এ হেন সময়ে

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যের মতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বাধীন চিত্তের ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলাভাষা সকল প্রকারের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত।

যে সময় বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতের নকল করিতেছিল, বড় বড় আভিধানিক শব্দে ও দীর্ঘছন্দ সমাসে পূর্ণ হইতেছিল, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উহার সরলতা সম্পাদনের পথ দেখাইয়া দিলেন। বাঙ্গলাভাষা যাহাতে ভাবপ্রকাশিকা, শক্তিমতী, সুন্দর হয়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়া গিয়াছেন। চলিত ও কথোপকথনের ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের, এমন কি সাধারণ পারসী, আরবী ও ইংরাজী শব্দের প্রচুর সন্নিবেশ দ্বারা তিনি বাঙ্গলা ভাষার শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া উহার প্রকাশিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষার অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথ এখন অনুসৃত হইতেছে। তাহার ফলে বাঙ্গলাভাষা প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছতার দিকে আরো অগ্রসর হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "পিতাপুত্র" প্রবন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখিত "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :–

"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষারাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ তো কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতনতা আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।...বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে

সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা। আমার বিশ্বাস চন্দ্রাকান্তের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।"

বঙ্কিমের রচনায় সকল প্রকারের রস—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য; উপহাস, পরিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা, সমালোচনা, প্রকৃতি বর্ণনা ইত্যাদি সবই অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছু নাই।"

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষাকে প্রগতির দিকে যে বেগ দিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে উহা আজ এত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালে ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গদেশের কবিসম্রাট্ ছিলেন। তখনকার কবি-যশঃ প্রার্থীরা তাঁহারই ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ করিতেন। শব্দাড়ম্বর, অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদির প্রতি তখন বড়ই অনুরাগ ছিল। ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিম, দীনবন্ধু ইত্যাদি তাহারই প্রণালীর অনুসরণ করিতেন। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ললিত, লঘুললিত ছন্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। বালকেরাও আদিরস ঘটিত কবিতা লিখিতে সঙ্কোচ বিবেচনা করিত না। বঙ্কিমের পনের বৎসর বয়সের আদিরসাশ্রিত কতকগুলি কবিতার নমুনা আমরা পাইয়াছি।

যমকের উদাহরণ—

"আগে যে জীবন জুড়াত জীবন

সে বন এখন নাহিক সয়।"

জীবন ও বন শব্দদ্বয় জলের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার 'সে বন' একত্র করিয়া লিখিলে 'সেবন' কথাটির অর্থ হয় ব্যবহার

কবি বঙ্কিমচন্দ্র

আদিরসের উদাহরণ—

"যেই মত হরে, কণ্ঠে বিষ ধরে,
তেমনি গরল তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর॥"

বঙ্কিমের রচনা সম্বন্ধে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সর্ব্বাঙ্গীন ভাবকৌশল অতিশয় সন্তোষজনক। ইনি রূপক বর্ণনা স্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে, যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ধৃত করিতেছেন।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিবর পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র কবিবরের উপদেশানুসারে গদ্য রচনায়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উপন্যাস রচনাকালের কবিতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচিত কবিতার তুলনাই হয় না। মৃণালিনীতে গিরিজায়া যে সকল গান গাহিয়াছে তাহা সুরচিত ও সুললিত—

১। মথুরাবাসিনি মধুর হাসিনি, শ্যাম বিলাসিনি রে।

২। কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে;

৩। চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।

৪। সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

৫। কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান।

৬। পরাণ না গেল।

"বিষবৃক্ষে" হরিদাসী বৈষ্ণবীর "কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল" বেশ ভাবপূর্ণ। "আনন্দমঠে" তিনটী গান আছে, তন্মধ্যে 'বন্দেমাতরম্'

এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্কিমচন্দ্র কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন এবং গানের উপর তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকট গান শিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাপুস্তকে বারোটী ছোট বড় কবিতা আছে। সেগুলিকে আমরা কোনো মতেই উচ্চদরের কবিসৃষ্টি বলিতে পারিনা। 'ভাই ভাই' কবিতাটী কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। উহাতে তিনি যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার কবি-হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। তাঁহার উপন্যাসগুলি গদ্যকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের বিভিন্ন চিত্র অতি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। অবস্থাভেদে প্রেম নানা আকার ধারণ করে। প্রেমের প্রকার নিম্নলিখিত নারী-চরিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে—

১। বিঘ্নবহুল এবং শেষে মিলনযুক্ত—তিলোত্তমা, কুন্দনন্দিনী, রজনী, সাগর।

২। মিলনাবস্থায় ধীর প্রেম—বিমলা, কমলমণি।

৩। সাফল্যের আশারহিত প্রেম—আয়েশা, শৈবলিনী, মনোরমা, লবঙ্গলতা।

৪। অপবিত্র প্রেম—রোহিণী, পদ্মাবতী।

৫। অন্যের প্রতি আসক্ত পতিতে প্রেম—সূর্যমুখী, ভ্রমর।

৬। সহধর্মিণী—শান্তি, নন্দা, কল্যাণী প্রফুল্ল।

(৭) পতির প্রেম প্রত্যাখ্যানকারিণী—কপালকুণ্ডলা, শ্রী।

(৮) আদর্শ শিক্ষাপ্রাপ্তার পতিপ্রেম—প্রফুল্ল।

(৯) পার্থিব প্রেমে অনাসক্তা—নিশা, জয়ন্তী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মেজঠাকুরদাদার নিকট **দুর্গেশনন্দিনী** ও **আনন্দমঠের** গল্পাংশের আভাস পাইয়াছিলেন। **কপালকুণ্ডলা** অপূর্ব কবিসৃষ্টি। এই যুবতীর উপর বাল্যে প্রকৃতির যে ছাপ পড়িয়াছিল, এবং নির্জন অরণ্য-প্রদেশের প্রতি যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা কখনো বিলুপ্ত হয় নাই. স্বাধীনতার প্রতি তাহার অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, সমাজের নিয়মানুসারে সে চলিতে পারে নাই। সুখে দুঃখে সে নির্লিপ্ত। তাহার স্বামী নবকুমারের প্রতিও তাহার একাগ্র স্নেহ ছিল না। সে স্বেচ্ছায় দেবতার নিকট বলি হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। **মৃণালিনীতে** মনোরমা একটি অদ্ভুত চরিত্র। কপালকুণ্ডলার সহিত উহার কিয়ৎ-পরিমাণে তুলনা হইতে পারে। বাল্যে পশুপতির সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তৎপরেই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে যখন তাহারা নবদ্বীপে গিয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা পরস্পরকে চিনিত না। সেখানে সে বিধবা বলিয়া পরিচিতা ছিল। কিছুকাল পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, উচ্চ রাজকর্মচারী পশুপতিই তাহার স্বামী। কিন্তু সে ইহা কাহারো কাছে প্রকাশ করিল না। বিধবা বলিয়া পরিচিতা মনোরমার প্রতি পশুপতির অবৈধ প্রণয়ের সঞ্চার হইল। সে পশুপতির পরিণীতা পত্নী হইয়াও আত্মপ্রকাশ করিল না। পশুপতি বিধবা-বিবাহে সম্মত ছিলেন। **বিষবৃক্ষে** সূর্যমুখী আদর্শ হিন্দু স্ত্রী এবং যথার্থ পতিপ্রেমিকা। কিন্তু তাঁহার স্বামী নগেন্দ্রনাথ কামান্ধ হইয়া বিধবা যুবতী কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলেন। তিনি কামোন্মত্ত হইয়া এই কাজ করিয়াছিলেন—সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে করেন নাই।

চন্দ্রশেখর পুস্তকে তিনটী চরিত্র আলোচনাযোগ্য—চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী। চন্দ্রশেখরে মহাপুরুষের সব লক্ষণই বিদ্যমান। তিনি দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চরমোৎকর্ষ, সংসারে থাকিয়াও অনেকটা বন্ধনবিমুক্ত। তিনি জ্ঞানপিপাসু, অধর্মবিদ্বেষী,

এবং পরোপকারী। পত্নী শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার প্রেম অসীম। কিন্তু শৈবলিনী অতি পাপিষ্ঠা। এমন দেবতুল্য স্বামী পাইয়াও তার মন উঠিল না। সে তার বাল্যকালের সহচর প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না—তার অন্তর প্রতাপে পরিপূর্ণ। অনেক ঘা খাইয়া শেষে তার সুবুদ্ধি ফিরিয়াছিল। প্রতাপের চরিত্রে মহত্ত্বের ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি ঘরে, কি বাইরে, কি রণাঙ্গণে, কি মরণে, আমরা তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বলের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই। তিনি অসীম সাহসী, নম্র, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী। ইংরাজদের প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাহাদের কয়েকটী অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, বাংলাদেশ হইতে ইংরাজজাতিকে তাড়াইতে না পারিলে দেশের নিস্তার নাই। উদয়নালার যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখাইয়া প্রতাপ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই অসাধারণ চরিত্রগুলির কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটী বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মানব জীবনের কয়েকটী কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কপালকুণ্ডলা" "চন্দ্রশেখর" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল"—এই তিন খানি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পাঠক কোন্ খানিকে আপনি সর্বোচ্চ স্থান দিবেন?

রজনী—এক অন্ধ ফুলওয়ালী অবলম্বনে রচিত মধুর উপন্যাস। ইহাতে লিটনের "লাস্ট্ ডেজ্ অব্ পম্পেই" নামক উপন্যাসের ছায়া এবং উইল্কী কলিন্সের "উয়োম্যান ইন হোয়াইট্"এর বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রত্যেকে নিজের কথা নিজে বলিতেছে। এই উপন্যাসখানি এক অন্ধ যুবতীর প্রেমের ও মূক বিরহ-ব্যথার অপূর্ব চিত্র। দৃষ্টিশক্তিহীনা রজনী যুবক ডাক্তার শচীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে প্রথমে আকৃষ্ট হইয়া পরে একদিন তাঁহার হস্তস্পর্শ ক্ষণমাত্র অনুভব করিয়া তাঁহাকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে

দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান বুঝিয়া এবং তাহার দুরাশার ব্যর্থতা অনুভব করিয়া সে হৃদয়াগুণে অহরহঃ দগ্ধ হইত। ইতিমধ্যে অমরনাথ নামে এক সদাশয় ব্যক্তি তাহাকে জানাইলেন যে, সে প্রভূত সম্পত্তির মালিক, এবং তিনি বহু চেষ্টা করিয়া তাহাকে তাহার পরহস্তগত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে রজনী অমরনাথের নিকট অশেষ ঋণী হইল। অমরনাথ তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে সে তাহার সমস্ত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার কৃতজ্ঞ হৃদয় অমরনাথের সুখকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু অমরনাথের চরিত্রও কম মহৎ নয়। তিনি রজনীর হৃদয়ের কথা জানিতে চাহিলে, সে অকপটে সব কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল—কিছুই গোপন করিল না। শচীন্দ্রনাথের বিমাতা লবঙ্গলতা শচীন্দ্রনাথের সহিত রজনীর বিবাহ সংঘটিত করিলেন। প্রথম যৌবনে অমরনাথের একবার পদস্খলনের উপক্রম হইয়াছিল এবং তিনি এপর্যন্ত লবঙ্গলতাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবনে তিনি যেরূপ সংযম ও ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহা বিরল।

দৃষ্টিহীনা রজনী ধীরা, সদাসঙ্কুচিতা, সরলা, কৃতজ্ঞা ও আত্ম-বলিদানে উদ্যতা। দৃষ্টিশক্তিলাভ করিয়া এবং অভীপ্সিত স্বামী পাইয়া সম্পন্ন অবস্থায় তাহার সরলতা ও অকপটতা বিনষ্ট হয় নাই। আমরা শেষে তাহাকে মাতৃরূপে দেখিতে পাইয়াছি। লবঙ্গ নবীনা—বয়স উনিশ বৎসর—তাঁহার স্বামীর বয়স তেষট্টি বৎসর। তিনি দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, স্বামীর আদরিণী। পিতামহতুল্য স্বামীকে তিনি যথার্থই ভালবাসিতেন। সতীত্বে তিনি অটল। অল্পবয়সে তিনি পাকা গৃহিণী—চরিত্রগুণে তিনি তাঁহা অপেক্ষা বড় সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রনাথের সম্মান লাভ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। প্রণয়ের পরিতৃপ্তি না হওয়াতেও তিনি শৈবলিনীর মত ব্যর্থতার পরিতাপ দেখান নাই।

কৃষ্ণকান্তের উইলে দুইটী চরিত্র বিশেষ করিয়া সকলের সম্মুখে

পড়ে—গোবিন্দলাল ও ভ্রমর। রোহিণী অনিন্দ্য-সুন্দরী বিধবা যুবতী। একদিন তার রোদন দেখিয়া গোবিন্দলালের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। ঐ দয়া ক্রমশঃ সহানুভূতিতে পরিণত হইল। গোবিন্দলাল ধার্মিক, সংযমী ও সহৃদয়। সে সময়ে তিনি রোহিণীর রূপের মোহে পড়েন নাই। গোবিন্দলালের স্ত্রীর নাম ভ্রমর। গোবিন্দলাল সুপুরুষ—ভ্রমর কালো। তবু তিনি ভ্রমরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এ প্রণয়ে রূপজ মোহ নাই, গুণজ মোহ।

রোহিণী প্রথম হইতে গোবিন্দলালকে আকাংক্ষা করিত। একদিন সে তাহা গোবিন্দলালের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু গোবিন্দলাল সংযমী—বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। যেদিন নিমজ্জমানা রোহিণীকে গোবিন্দলাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন, সেই দিন হইতে রোহিণী সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল—তিনি রূপের আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ মোহ কাটাইবার জন্য বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি রোহিণী হইতে দূরে পলায়নের জন্য কাজকর্ম দেখিবার ব্যপদেশে এক দূরস্থ মহলে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন বাসনা দমন করিতে করিতে তিনি স্বীয় বাসনা-দমনে সমর্থও হইলেন।

ভ্রমরের প্রতি তাঁহার মনের ভাব ক্রমে যেন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ভ্রমরের নিকট হইতে তিনি এই পত্র পাইলেন, "সেদিন রাত্রে বাগানে তোমার কেন দেরী হইয়াছিল তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বল নাই, কিন্তু আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে অলঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে আমাকে স্বয়ং দেখাইয়া গিয়াছে। তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তাহা নয়। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার

ভক্তি নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই। তুমি বাড়ী আসিবার পূর্বে আমি পিত্রালয়ে যাইব।" •

গোবিন্দলালের অকলঙ্ক চরিত্রে ভ্রমর অন্যায় রূপে কলঙ্ক আরোপণ করিতেছে দেখিয়া তিনি সেই দিনই বাটী রওনা হইলেন। পৌঁছিয়া ভ্রমরকে বাটিতে দেখিতে পাইলেন না। ভর্ত্তার অভিমান হইল।

ভ্রমরের পতিভক্তি অসামান্য—অভিমানও তদধিক। পাপে তার বড়ই ঘৃণা। গোবিন্দলালের উপর বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি তাঁর উইলে বিষয়ের অর্দ্ধাংশ গোবিন্দলালকে না দিয়া, গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। ইহাতে ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের অভিমান আরো বৃদ্ধি পাইল। মাতাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া গোবিন্দলাল আর বাড়ি ফিরিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি ভ্রমরের মুখ আর দেখিবেন না। রোহিণীর চিন্তায় ভ্রমরকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এখন পূর্ণ যৌবন। ভ্রমর হইতে তাঁহার রূপতৃষ্ণা মিটে নাই—তিনি রোহিণীর বাহুতে ঝাঁপ দিলেন। তাহার পরে রোহিণীর সহবাসে তিনি কিরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। অবশেষে রোহিণীকে হত্যা করিয়া পাপের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। পতিপরায়ণা হইয়া ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ ভ্রমর গোবিন্দলালকে অযথা দুর্বাক্য বলিয়া ফেলিত—রাগ হইলে তাহার জ্ঞান থাকিত না। যখন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া গোবিন্দলাল অর্থ-সাহায্যের জন্য ভ্রমরের নিকট পত্র লিখিলেন, তখন সে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় লইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বলিয়াছিল, "আপনার সঙ্গে আমার ইহ জন্মে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" অথচ আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া পতি-সন্দর্শনের জন্য ভ্রমর লালায়িত। তাহার বাসনা পূর্ণ

হইয়াছিল—স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভ্রমর প্রাণত্যাগ করিতে পারিয়াছিল।

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম

এক্ষণে আমি শেষ স্তরের উপন্যাস তিনখানির প্রথমে সমষ্টিগত আলোচনা করিয়া, পরে তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করিব। তিনখানিতে ঘটনা পরাম্পরা সজ্জিত করিয়া নিষ্কাম ধর্ম তিন প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই উপন্যাস তিনটীতে মনুষ্যজীবনের কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে, এবং তাহাদের সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, সংসারী না হইয়া অর্থাৎ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া, কর্মত্যাগে কার্যসিদ্ধি হয় না। যিনি সংসারী হইয়া নির্লিপ্ত, তিনিই প্রকৃত ধর্মমত অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

সকলের অনুষ্ঠেয় কর্ম এক নয়—অধিকারী ভেদে কর্মপন্থা বিভিন্ন হয়। তিন খানি উপন্যাসেই স্বদেশোদ্ধারই অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে—কিন্তু আনন্দমঠে সমষ্টিগত ভাবে, দেবীচৌধুরাণীতে ঐশ্বর্যযুক্ত শক্তির সাহায্যে এবং সীতারামে সমষ্টি ও ব্যষ্টির সংমিশ্রণে। বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালে দেশোদ্দীপনার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে যথার্থ ধারণা ছিল না। তখন তাঁহারা পুরাণ হইতে বা রাজস্থানের ইতিহাস হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া তদবলম্বনে তাঁহাদের কাব্য রচনা করিতেন। বাংলাদেশে তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যের উপযোগী বিষয় খুঁজিয়া পাইতেন না। বাঙ্গালীরা কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইত। অন্ততঃ ইংরাজেরা তাহাদিগকে ঐ আখ্যা দিয়া কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গালীর কলঙ্কোপনোদনের নিমিত্ত এবং তাহাদের দেশাত্মবোধ প্রবুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস তিনখানি রচনা

করিয়াছিলেন। এই উপন্যাস তিন খানিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। আনন্দমঠের সন্তানেরা বাঙ্গালী, প্রফুল্ল বঙ্গাঙ্গনা এবং সীতারাম বাঙ্গালী রাজা। বঙ্কিমচন্দ্র কঁতের (Comptএর) মতানুসরণ করিয়া সর্বাগ্রে আনন্দমঠে সমষ্টিগত সাধনার ক্রিয়া, তৎপরে দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার ক্রিয়া, অবশেষে সীতারামে সমন্বয় যুক্ত সাধনার ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে পরিবেষ্টনকে প্রভাবশালী করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক ভাবে দলবদ্ধ হইয়া সর্বস্ব-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প না হইলে জাতির মুক্তি হয় না, ইহাই তিনি আনন্দমঠে দেখাইয়াছেন। তৎপরে দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সামাজিক অধিকারভুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত মানবতার উন্মেষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। শেষে সীতারামে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আদর্শ পুরুষও মোহাচ্ছন্ন হইলে তাঁহার অর্জিত সিদ্ধি ব্যর্থ হইয়া যায়।*

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন, "তুমি প্রেমের মোহে পড়িয়া যেন তোমার সাধনাকে নষ্ট করিয়া ফেলিও না।" ভবানন্দের কল্যাণীর জন্য মোহ, প্রফুল্লের স্বামীর ও গৃহস্থাশ্রমের প্রতি অনুরাগ এবং সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মত্ততা—তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিয়াছিল।

আর্টের হিসাবে এই তিন খানি উপন্যাস তত উচ্চস্তরের না হইলেও উপদেশের হিসাবে ইহারা সম্পূর্ণ ও নির্দোষ। ধর্মানুশীলন-তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস তিনখানি লিখিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, শারীরিক বলের সাধনা করিতে হইবে, কিন্তু সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ী কার্য করিতে পারে না. উচ্ছৃঙ্খলতা সাধনার অন্তরায়। নৈতিক-শক্তি-সাধনার প্রথম সোপান জ্ঞান ও কর্মে আত্ম-সমর্পণ। এ সাধনায় জীবন তুচ্ছ—সাধকের চিত্তে [illegible] "ভক্তি"।

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দমঠ

আনন্দমঠে বঙ্গদেশের দারুণ দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। মাতৃভূমিকে কি প্রকারে এই দুর্দশা হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে? সত্যানন্দ নামে এক সর্বত্যাগী স্বদেশানুরাগী সন্ন্যাসীর চক্ষে দেশের এই দুর্দশা প্রথম প্রতিভাত হইল। স্বদেশকে শ্মশানবৎ দেখিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

সন্ন্যাসী সত্যানন্দ গীতোক্ত কর্মযোগই স্বীয় মানসিক ও শারীরিক শক্তির উপযোগী বিবেচনা করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইলেন। যে কর্ম করিতে হইবে তাহা ভগবানের প্রীতিপদ হওয়া আবশ্যক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ভগবানের প্রীতিপদ কর্মসমূহের অন্যতম বিবেচনা করিয়া, উহাই তিনি নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন।

১১৭৪ সালে বাংলা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নবাবী আমল—কর আদায়ের কর্তা মহম্মদ রেজা খাঁ কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করিতেন। ইহার উপর দেশে নানারূপ রোগ দেখা দিল। গৃহে গৃহে বসন্তে ও অন্যান্য রোগে লোক মরিতে লাগিল। চিকিৎসা হয় না। কে কাহাকে দেখে? মরিলে কেহ ফেলে না। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

মুসলমান রাজার অত্যাচার হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য সত্যানন্দ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সত্যানন্দ ভাবিলেন, রাজার প্রজানুরাগের অভাবই প্রজার কষ্টের কারণ। প্রতিষ্ঠিত রাজাকে দূর করিতে না পারিলে, অভিলষিত রাজা বসান যাইবে না। তজ্জন্য প্রতিষ্ঠিত রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করা চাই। যুদ্ধ কাহারা করিবে? যাহাদের দেশানুরাগ আছে, তাহারাই। অতএব দেশানুরাগ জাগরিত করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে দেশানুরাগের উদ্দীপনা দিয়া তাহাদিগকে নিজ দলে

আনিতে হইবে। নিজের দল পুষ্ট হইলে দেশীয় রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হইবে। উদ্দীপনা দিবার একটী প্রধান সহায় ছিল 'বন্দেমাতরম্' গান। এই গান অনেকের মন হরণ করিল। ইহার প্রভাবে অনেকে সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত "সন্তান" নামক সম্প্রদায়ে যোগদান করিল।

সত্যানন্দ অসহায়। এই অসহায় অবস্থা তাই তাঁহার অধ্যবসায়-বলে তিনি "সন্তান" দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্বার্থ কর্মী, এবং স্বীয় জীবন দান করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সন্তানেরা নিরস্ত্র, অসহায়। ওদিকে শাসনকর্তার অধীনে সহস্র সহস্র সশস্ত্র সৈন্য।

১১৭৬ সালে (দুর্ভিক্ষের ও মহামারীর প্রকোপ তখনো প্রশমিত হয় নাই) ইংরাজ বাংলার দেওয়ান। কর লইবার ভার নবাব মিরজাফরের নিজের হাতে। যাহা কিছু আদায় হইত, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় চালান হইত। সন্তানেরা কয়েক বার রাস্তা হইতে ঐ ধন লুট করিয়াছিল। নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাহাদের যে আশ্রম ও দেবালয় ছিল, তাহারি কোষাগারে লুটের ধন সঞ্চিত হইত—উদ্দেশ্য ঐ ধনের সাহায্যে মাতৃভূমিকে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করা।

"সন্তান" কথাটির অর্থ দেশমাতার সন্তান। অরণ্য মধ্যস্থ দেব-মন্দিরে দেশমাতার তিনটী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—একটী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী-রূপিণী, আর একটী নগ্না ও শীর্ণা কালী-রূপিণী এবং তৃতীয়টী মহিষমর্দিনী সিংহ-বাহিনী দুর্গারূপিণী। প্রথমটী দেশমাতার অতীত রূপ, দ্বিতীয়টী দেশমাতার তখনকার রূপ এবং তৃতীয়টী দেশমাতার ভবিষ্যৎ রূপ। সন্তানেরা বলিত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—জন্মভূমিই তাহাদের জননী। তাহারা মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া এই দলে যোগ দিয়াছে। তাহারা বলিত "আমাদের আছেন কেবল

সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা।" তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে রাজা রাজা নয়। সে রাজার টাকা লুট করাতে পাপ নাই। তাহারা বলিত "মুসলমান রাজার আমলে সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই। প্রজার উদরে অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই।"

মুসলমান রাজার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া হাজারো হাজারো লোক সন্তানদলভুক্ত হইতে লাগিল। সন্তানেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী দীক্ষিত বা আনুষ্ঠানিক সন্তানের দ্বারা গঠিত—তাহারা সংসার ত্যাগী। দ্বিতীয় বা অদীক্ষিত শ্রেণীতে ছিল সাংসারিক ব্যক্তিরা। মহেন্দ্র নামক এক অদীক্ষিত সন্তান-জমিদারের বাড়িতে কামান, গোলা, বারুদ তৈয়ার হইতে লাগিল। বহুকাল ধরিয়া উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলিল। সন্তানদের বিপক্ষে ইংরাজ সেনা আসিল। কিন্তু সন্তানেরা প্রায়ই জয়ী হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে সন্তানদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিল। অনেকে সন্তানদের মূলনীতি ভুলিয়া গিয়া অত্যাচারী হইয়া পড়িল। আনুষ্ঠানিক সন্তানেরা তাহাদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। সত্যানন্দ আনুষ্ঠানিক সন্তানগণকে যেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা পালন করা একপ্রকার অসম্ভব। বিবাহিত ব্যক্তিকে স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাখাতে সুফল পাওয়া যায় না। সত্যানন্দের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক, তাহার সাধনার্থ তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাকে সাধু পন্থা বলা চলে না। দস্যুতা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করাকে কেহই অনুমোদন করিতে পারে না। এরূপ অসৎ কার্যের ফল ভাল হইতে পারে না। দস্যুতা শিখিয়া অদীক্ষিত সন্তানেরা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী—ইহাই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন।

সত্যানন্দ নিজে কখনো নীতি-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার স্বদেশানুরাগ

অকৃত্রিম ও প্রগাঢ়। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্বার্থ। যুদ্ধে জয়লাভের পর জীবানন্দ সত্যানন্দকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ঘৃণার সহিত ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কিছুই হইতে চাহেন নাই।

এই গ্রন্থে শান্তি নামে একটী সুন্দর স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শান্তি জীবানন্দের বিবাহিত পত্নী। তিনি জীবানন্দের সহিত একত্রে বাস করিয়াও জীবানন্দের ব্রত ভঙ্গ হইতে দেন নাই। শান্তি অতুলনীয় ধৈর্য, সংযম ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, এবং পতনোন্মুখ স্বামীকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যথার্থ সহধর্মিণী পদবাচ্যা। আনন্দমঠে জীবানন্দ ও শান্তিই কেন্দ্র-চরিত্র। আর একটী সুন্দর স্ত্রী চরিত্র কল্যাণী।

আনন্দমঠের গৌরব চরিত্রোন্মেষে নয়, গল্পাংশের গঠনে নয়—উহার মহিমা মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শনে এবং "বন্দেমাতরম্" গানে। মূর্ত্তি-প্রতিমাকে কেমন ভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ইহাতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সন্তানেরা "বন্দেমাতরম্" গানেও মায়ের স্বরূপ দেখাইয়াছিল।

দেবী চৌধুরাণী

যে মূল নীতি "আনন্দমঠে" ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই মূল নীতিই "দেবীচৌধুরাণীতে" আর এক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "আনন্দমঠে" দেখা গিয়াছে যে, সত্যানন্দ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াও স্বদেশ উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প। স্বদেশের প্রতি তাঁহার ভক্তি অসাধারণ। তিনি স্বার্থশূন্য ও নির্লোভ—তিনি বুদ্ধিমান্, কৌশলী, সতর্ক ও কার্য্যতৎপর।

"দেবীচৌধুরাণীর" ভবানী পাঠকও স্বদেশানুরক্ত, নিঃস্বার্থ ও কার্যকুশল। যে ভ্রমে সত্যানন্দ পড়িয়াছিলেন, সেই ভ্রমে তিনিও পড়িয়াছিলেন—দেশোদ্ধারের জন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থসংগ্রহ করা।

সত্যানন্দ যেমন জীবানন্দ, ভবানন্দ ইত্যাদিকে স্বমতাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তাঁহাদের দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, ভবানী পাঠকও সেইরূপ প্রফুল্লকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা মাধুর্যময়ী শক্তিমূর্তিরূপে গড়িয়া তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া দেশের দুর্গতি নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যানন্দ যেমন জীবানন্দ, ভবানন্দ ইত্যাদিকে স্ত্রীপুত্র, ঘরবাড়ি ত্যাগ করিবার নিয়মে আবদ্ধ করিয়া স্বদেশানুরাগ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, ভবানী পাঠকও তেমনি প্রফুল্লকে নিষ্কামভাবে রাণীগিরি করিবার শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। আনন্দমঠে যেমন বিবাহিত সাংসারিক লোককে স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার নিয়ম বিফল হইয়াছিল, দেবীচৌধুরাণীতেও তেমনি প্রফুল্লকে স্বামী হইতে বিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছিল। এত শিক্ষার পরও প্রফুল্ল স্বামী-সেবার জন্ত সংসারে ফিরিয়া গেলেন এবং প্রমাণ করিলেন যে, পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। "দেবী চৌধুরাণীর" নিশাতেই গীতোক্ত ধর্ম বদ্ধমূল হইয়াছিল, কারণ তিনি পতিহীনা ও সংসার ত্যাগী। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি বিস্ময়কর।

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের সম্যক্ অনুশীলন না হইলে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় না—ইহা দেখাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লের শিক্ষার যে প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক।

সীতারাম

তৃতীয় স্তরের তৃতীয় উপন্যাস সীতারাম। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, রাজা সীতারাম তেজস্বী, স্বদেশপ্রেমিক, কর্মী, সত্যাশ্রয়ী, পরোপকারী

হইয়াও স্বীয় বিবাহিতা পত্নীকে অত্যাধিক আকাংক্ষা করাতে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সীতারামের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম ছিল—মুসলমানের অত্যাচার হইতে হিন্দুর মুক্তিসাধন। তাহা তিনি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইল। একটা সুন্দর ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান সমভাবে পালিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ রাজার ব্যবহারে পরম প্রীত। তাহারা একান্ত রাজভক্ত হইয়া পড়িল। যেমন চন্দ্রচূড়, তেমনি চাঁদশাহ সীতারামের মন্ত্রণা কার্যে ব্রতী হইলেন।

ইহার পর সীতারাম আর একটা কর্মে হাত দিলেন—তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী শ্রীকে গ্রহণ করা। সীতারাম পিতৃ আজ্ঞায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ জ্যোতিষের গণনায় জানা গিয়াছিল যে, তাঁহা হইতে সীতারামের অমঙ্গল ঘটিবে, তৎপরে সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। পত্নীদের নাম—রমা ও নন্দা। ধর্মপত্নীদের সকল গুণই শ্রীতে বিদ্যমান। তিনি সুন্দরী, সাধ্বী, পতিব্রতা। সীতারাম তাঁহাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করামাত্র তিনি পলায়ন করিলেন—পাছে তাঁহা কর্তৃক তাঁহার স্বামীর কোন অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায়। সীতারাম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীর অন্বেষণ বেগে চলিতে লাগিল। শ্রীর চিন্তা ভিন্ন সীতারামের অন্য কোনো চিন্তা নাই। শ্রীর চিন্তায় তিনি নিজ কর্তব্য ভুলিলেন। দেশ যায়, ভ্রূক্ষেপ নাই। যে সীতারাম হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, তিনি এখন রাজকর্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরে সীতারাম স্ত্রীকে পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে স্ত্রীর আকাংক্ষা করিয়াছিলেন, এ শ্রী সে শ্রী নয়। সে শ্রী মানুষী ছিল—এ শ্রী পাষাণী। শ্রী বলিলেন, "যেদিন তোমার হইতে পারিলে, আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।" এখন শ্রী সম্মুখে কিন্তু সীতারাম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। সীতারামের

অধীরতা ক্রমশঃ বাড়িল। তাঁহাদের শয়নগৃহ পৃথক্। শ্রীর বাঘছালের নিকট সীতারাম ঘেঁসিতে পারিতেন না।

সীতারাম কামনায় শান্তিহারা। রাজ্য ছারে খারে যাইতে লাগিল, শেষে শ্রী পলাইলেন। দারুণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ধার্মিক রাজা সীতারাম শ্রীর সহচরী তাপসী জয়ন্তীকে ধরিয়া আনাইয়া উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। রাণী নন্দা জয়ন্তীকে অনেক কষ্টে রক্ষা করিলেন। মহাভারতে যেমন দ্রৌপদীর অবমাননা করাতে কৌরবদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল, এখানেও নিরপরাধা সাধ্বী জয়ন্তীর অবমাননা করাতে সীতারামের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

ইন্দ্রিয়দমন ভিন্ন সংসারীরও পতন হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্মিণীর সহবাসও অনুচিত। সীতারামের ভার্য্যাসম্ভোগতৃষ্ণাই তাঁহার পতনের মূল। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, আবার ফল হইতে বীজ, সেইরূপ শ্রীর রূপ দেখিয়া সীতারামের সেই রূপের অহরহঃ চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে লালসা, লালসার বিফলতায় ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে পতন।

পতনের পর অল্প দিনের জন্য সীতারামের সুমতি হইয়াছিল। তাহার ফলে তাঁহার আবার ঈশ্বর-ভক্তি হইয়াছিল এবং তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। গল্পের এই অংশটি অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, যে-রমণীর স্বামী বর্তমান, তাহার সন্ন্যাস নাই। শ্রীর অন্তর পতিসম্বন্ধশূন্য ছিল না। অতএব তাঁহার পক্ষে সংসারত্যাগ অবিহিত হইয়াছিল। 'সীতারামের' জয়ন্তী ও 'আনন্দমঠের' নিশা একই ছাঁচে ঢালা।

প্রথম অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি মানবজীবনের একটা মাত্র

সমস্যার (প্রেমের) দিকে নিবদ্ধ ছিল। শেষে মানবজীবনের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল। আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণীতে ও সীতারামে তিনি দেখাইয়াছেন—"মানবের অনুষ্ঠেয় কি, তাহাতে কিরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। আদর্শের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি রাখাতে, এই উপন্যাসত্রয়ে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কমলাকান্তরূপেও তিনি মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, "দেখিলাম অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। আমি নিতান্ত একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল। নিতান্ত একা মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার! কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর সমুদ্রে কোথায় তুমি ?* * * সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। এই কি মা ? হাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা, একণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না; কিন্তু একদিন দেখিব এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ

প্রতিমা। * * * এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই, এস আমরা দ্বাদশ কোটী ভুজে এই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটী মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ভয় কি? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

'কমলাকান্তের দপ্তর' একখানি উৎকৃষ্ট ভাবপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় পুস্তক। উহার আবেগময়ী ভাষা অপূর্ব। উহাতে সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের মনস্তত্ত্ব মধুর ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বঙ্গদেশের কৃষক" "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" "ভারতকলঙ্ক" প্রভৃতি অত্যুপাদেয় প্রবন্ধনিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

এই নব জাগরণ কিরূপে আসিবে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন। সনাতন ধর্ম জ্ঞানাত্মক। সেই জ্ঞান দুই প্রকারের—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ অন্তর্বিষয়ক। বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থূলের তত্ত্ব জানা না থাকিলে সূক্ষ্মের তত্ত্ব জানা যায় না। এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা হয় না বলিয়া সনাতন ধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে বহির্বিষয়ক জ্ঞানার্জন আবশ্যক। ইংরাজেরা বহির্বিষয়ক জ্ঞানে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে।

অতএব এখন আমাদিগকে ইংরাজের নিকট জড়-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই আমরা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ বুঝিবার অধিকারী হইব। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের এখনকার প্রগতি প্রতীচ্য শিক্ষার ফল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আগেই তাহার উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

"বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল সমালোচনা বাহির হইত, তাহা

পক্ষপাতশূন্য। তাঁহার তীব্র সমালোচনার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে গালি খাইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই—তিনি তাঁহার কর্তব্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। এক্ষণকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অভাবে শাসন-ভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।"

সমালোচনার তাঁর কশাঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জনা প্রবেশ করিতে দেন নাই।

সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেও কতকগুলি সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন, এবং বহুবিবাহও পছন্দ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি শিক্ষার জন্য বিলাত গমনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা মোটেই ভালবাসিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, সন্তানদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। অথচ মহেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় বলিয়া দীক্ষিত সন্তান হইতে পারেন নাই। দুইখানি উপন্যাসে বিধবাবিবাহের পোষকতা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু ইংরাজ-স্তোত্র হইতে জানা যায় যে তিনি বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন।

তা ছাড়া সনাতন ধর্ম ও আচারব্যবহারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কেবল তিনি পাশ্চাত্য মনীষীদের ভাবধারা দ্বারা উহার কিছু সংস্কার করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীতে, আনন্দমঠের শান্তি ও কল্যাণীতে,

এবং দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্লতে পতিভক্তির, এবং দেবীচৌধুরাণীর ব্রজেশ্বরে পিতৃভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। এই সন্ন্যাসিগণ পরহিতব্রত, জ্ঞানী ও ধার্মিক। তাঁহারা ভণ্ড নন্—তাঁহারা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। মৃণালিনীর মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখরের রামানন্দ স্বামী, রজনীর সন্ন্যাসী, আনন্দমঠের সত্যানন্দের গুরু চিকিৎসক, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক এবং সীতারামের চন্দ্রচূড়—এইরূপ নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ।

ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি একখানি বাংলার ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যে "ভারত কলঙ্ক" ও "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" নামক কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আর্য ও অনার্যগণের বাস সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তারচেয়ে এখনো কেহ অধিক কথা লিখিতে পারেন নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার প্রধান সহায়—প্রাচীন গৃহ বা মন্দির, গার্হস্থ্য উপকরণ, অলঙ্কার, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং প্রাচীন পুঁথী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "দ্রৌপদী", "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি", "আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প", বাঙ্গালীর "বাহুবল", "ভারতকলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার", "বাঙ্গলার ইতিহাস", "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি তাঁহার অনুসন্ধিৎসার ফল।

কিন্তু তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্রই" তাঁহার গভীর গবেষণার ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। উহা একাধারে প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব।

পরিহাস-রসিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় তাঁহার প্রায় সব গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার লোকরহস্যে ও কমলাকান্তের দপ্তরে। দুর্গেশনন্দিনীতে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সহিত আসমানীর কৌতুকে, মৃণালিনীতে গিরিজায়ার বাক্যালাপে, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র কর্তৃক সূর্যমুখীর অনুসন্ধান কালে, কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর জন্মদিকীর ছটী কথায় সংখ্যা গণনায়, আনন্দমঠে শান্তির কথাবার্তায়, দেবীচৌধুরাণীতে বজরার উপর নানা কৌতুকে, চন্দ্রশেখরে গৃহিণী ঠাকুরাণী ও প্যাঁচিকা সম্বন্ধে আলোচনাতে অনেক রস পাওয়া যায়।

"লোকরহস্যের" সবস্থানে লেখাতেই হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। বিষয়গুলির নামেতেই হাস্যের উদ্রেক করে।

(১) "বাঘাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলে" ব্যাঘ্রদিগের এক মহাসভার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—সভাপতি অমিতোদর নামক এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্র—বক্তা বৃহল্লাঙ্গুল—বিষয় মনুষ্য চরিত্র। বক্তার মুখে মানুষের নাম শুনিয়া কোনো কোনো নবীন সভ্য ক্ষুধাবোধ করিলেন। বক্তা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই দিন ধরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতানুযায়ী বক্তৃতা করিলেন। প্রথম দিন তিনি মনুষ্যের গৃহ, আহার, পশুপূজা, বানর হইতে তাহার উৎপত্তির আলোচনা করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বক্তা মনুষ্য-সমাজে বিবাহ বলিয়া যে প্রথা আছে, তাহার এবং পুরোহিত বলিয়া এক শ্রেণীর মনুষ্যদের শাসন অনুসারে দম্পতি চিরদিন পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকে, তাহার কথা বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের বিবাহ কিন্তু নৈমিত্তিক। মনুষ্যমধ্যেও এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে—

সুসভ্য মনুষ্যদের মধ্যেই ইহা অধিক আদৃত।" পরে তিনি মৌদ্রিক বিবাহেরও ব্যাখ্যা করিলেন, এবং মনুষ্য-সমাজে মুদ্রা নামে একটী দেবী আছে জানাইলেন—দেবতাটী বড় জাগ্রত। যাহাদের ঘরে মুদ্রাদেবী বিরাজ করেন, তাহারা ক্ষুদ্রাকার হইলেও বড় লোক—তাহারা ধার্মিক, বিদ্বান্ ইত্যাদি। কিন্তু আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে মুদ্রাই মনুষ্যজাতির সত অনিষ্টের মূল। উহা হইতেই হিংসা, দ্বেষ, অনিষ্ট-চেষ্টা, অপমান, তিরস্কার, পীড়ন, হত্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মানুষ মুদ্রাভক্ত, এবং সততঃ রূপার চাকী ও তামার চাকী সংগ্রহে ব্যস্ত। তৎপরে দীর্ঘনখ মহাশয় বলিলেন, "মানুষ ভারি প্রভুভক্ত বলিয়া বিবাহ করে—প্রত্যেক মানুষের একটা প্রভু রাখা অনিবার্য বলিয়া"। ইত্যাদি।

(২) ইংরাজ স্তোত্র—হে ইংরাজ তুমি ত্রিগুণাত্মক, সচ্চিদানন্দ। তুমি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণ, সূর্য-অগ্নি-যম, বেদ-স্মৃতি-দর্শন। আমাকে ধন দেও, চাকরি দেও, যশ দেও, টাইটেল দেও, রায়বাহাদুর কর। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিব, নিষিদ্ধ ভোজন করিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব, বিধবার বিবাহ দিব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি।

(৩) বাবু—বাক্যে অজেয়, মাতৃভাষা বিরোধী। বাবুর রসনেন্দ্রিয় পরজাতি-নিষ্ঠীবনে পবিত্র। "বাবু" শব্দের নানা অর্থ—সাহেবের নিকট কেরাণী, নির্ধনের নিকট ধনী, ভৃত্যের নিকট প্রভু। বাবু কাব্যরসে বঞ্চিত, কিন্তু সমালোচনায় অতি পটু, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থমাত্র পড়িয়া অনন্ত জ্ঞানী। ইহার দশাবতার,—কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। ইহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য। যিনি আমার এই সকল কথায় বিপরীত অর্থ করিবেন, তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদের ভক্ষ্য হইবেন।

(৪) গর্দ্দভ—আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই—বিচারাসনে, বিদ্যালয়ে, চতুষ্পাটীতে। তুমি লক্ষ্মীর বরপুত্র, সুকণ্ঠ গায়ক। তুমি রামায়ণে দশরথ, মহাভারতে যুধিষ্ঠির। এক্ষণে তুমি সমালোচক। বিধাতা তোমাকে তেজ দেন নাই এজন্য তুমি শান্ত, মোট না বহিলে তুমি খাইতে পাও না এজন্য তুমি পরোপকারী।

অন্যান্য প্রসঙ্গগুলির নাম (৫) দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন, (৬) বসন্ত ও বিরহ, (৭) স্বর্ণ গোলক, (৮) রামায়ণ সমালোচনা, (৯) বর্ষ-সমালোচনা, (১০) বোনো শেয়ালের পত্র, (১১) Bransonis, (১২) হনুমদ্বাবু, (১৩) গ্রাম্য কথা, (১৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর, (১৫) New year's day. ইহাদের অধিকাংশ হাস্যরসোদ্দীপক।

ধর্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র

"কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্মতত্ত্ব" এই দুইখানি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ভাবে ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, "আনন্দমঠ" ইত্যাদিতে গৌণভাবে। কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে তিনি অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রের' উপক্রমণিকার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, (১) ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না? (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না?

কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন, "ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না।"

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন, "তিনি নিরাকার। তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন কি করিয়া ?,"

তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, "যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারিবেন না কেন ?" এখন প্রশ্ন এই যে "জগতের হিতের জন্য তাঁহার মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? যিনি ইচ্ছা করিলেই কোটী কোটী বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, রাবণ, কংস, শিশুপালের বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে কেন ?"

ধর্মসংরক্ষার্থ ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মসংরক্ষণ কাহাকে বলে ? আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ। অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধর্মপালন বলা যায়।

কেবল উপদেশে শিক্ষা হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের অনুকরণে ও আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে।' এইজন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।

মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ অতিমানুষী শক্তি দ্বারা কোনো কাজ করেন নাই। মহাভারতে বা পুরাণে যাহা অতিমানুষী বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহা পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য। তাঁহার সম্বন্ধে চোরাপবাদ বা পরদারপরায়ণাপবাদ অমূলক ও অলীক। পূতনাবধ, যমলার্জুনভঞ্জন, কালিয়দমন, গোবর্ধনধারণ ইত্যাদির বিবরণ প্রক্ষিপ্ত ও অবিশ্বাস্য। মহাভারতেই তিনি তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন। ধর্মতত্ত্বের সার কথাগুলি কোঁৎ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ —না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম—তাহাই মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। যিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর নন, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বরের উপসনাই সফল। তাঁহাকে ভাবাই উপাসনা। তাঁহার সর্বগুণসম্পন্ন স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত করিবার দৃঢ়ব্রত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়াকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়—ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্মকর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। সর্ববিধ কর্মানুষ্ঠানের জন্য কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাদিগের উন্নতি আবশ্যক—ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দেবতাতত্ত্ব" গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার প্রাপ্য, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ। অতএব কেবল সাহিত্য নয়, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।

যে টুকু হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম, যে টুকু সারভাগ, যে টুকু প্রকৃত ধর্ম, অনুসন্ধান করিয়া আমাদের সেই টুকু স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, কেবল

কলুষিত দেশাচার, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল ভণ্ড ও স্বার্থপরদের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি—শারিরীক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অধর্ম তাহা অসত্য। যদি মনুতে, মহাভারতে বা বেদে অসত্য থাকে তবু তাহা অসত্য ও অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।

আমি কোনো ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না। ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ। ধর্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দু ধর্ম তাহার উপর স্থাপিত। তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্মের যথার্থতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

কদাচিৎ ধর্মের সংস্কারক দেখা যায়—কোথাও ধর্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্টধর্ম নাই—সকল ধর্মই পরম্পরাগত। ধর্মের ঐতিহাসিক স্তরে ধর্মের প্রথম সোপান—"শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী" এই বোধ। জড়ে চৈতন্য আরোপ ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থা—(১) দেবোপাসনা, অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ এবং তাহার উপাসনা, (২) ঈশ্বরোপসনা এবং তৎসহ দেবোপাসনা এবং (৩) ঈশ্বরোপাসনা এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়। বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্য স্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিত হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গ ধর্ম, এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম।

ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরেরই ভজনা করে।

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্,
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটি-ভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে?

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্,
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্,
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন
লিখিত পুস্তকাবলী—

বাঙ্গলা

১। ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

২। সৃষ্টিরহস্য ... মূল্য ।০

৩। বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা ... মূল্য ।০

৪। আলোচনা ও কল্পনা ... মূল্য ।০

৫। ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—জীবনী, সার্বজনীন ধর্ম ও বিশ্বমানবতা ... মূল্য ॥০

৭। বঙ্কিম-প্রতিভা ... মূল্য ।০

৮। সুভদ্রাঙ্গী—ঐতিহাসিক উপন্যাস... মূল্য ১৲

৯। কুরল—(তিরবল্লুবরের নীতি বিষয়ক সরস প্রাচীন তামিল কাব্যের বঙ্গানুবাদ—গবেষণাপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ। প্রকাশক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) মূল্য ২॥০ টাকা

১০। বিবিধ প্রসঙ্গ (যন্ত্রস্থ)

১১। গ্রীক ও রোমান উপাখ্যানমালা (যন্ত্রস্থ)

১২। বাণীর চরণে অন্তিম অর্ঘ্য, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বেদান্তরত্ন লিখিত ভূমিকা সহ ... মূল্য ॥০

ইংরাজী

1, MIRA BAI—Her life with a discourse on her *Bhajans*. Price—annas Six.
Bagchi C/o, 72, Harrison Road Calcutta.

১। তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান কী উপক্রমণিকা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)

এই পুস্তক কলিকাতা, পাটনা, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা হিন্দীতে

এম-এ পরীক্ষার্থীগণের জন্য পাঠ্যরূপে নির্বাচিত।

মূল্য—বাধাই ৩॥০

২। সমালোচনা-তত্ত্ব, কাব্য-রহস্য, কলা-তত্ত্ব ঔর রহস্যবাদ-তত্ত্ব

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)। মূল্য—বাধাই ১॥০

৩। মোহন মালা (ছোটী গল্পেঁ)

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড (প্রয়াগ)। মূল্য—।৵০

৪। ভক্ত শিরোমণি মহাকবি সূরদাস

(জীবনী, কাব্যালোচনা ঔর চুনে হুয়ে পদ)

প্রকাশক—লালা রামনারায়ণ লাল (প্রয়াগ)। মূল্য—১

৫। দেবী চৌধুরাণী

প্রকাশক—গঙ্গা পুস্তকমালা কার্যালয়, (লক্ষ্ণৌ)। মূল্য—।

—:*:—

অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্ন্যাল, এম্-এ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ

—রূপ-রেখা—

বঙ্গের সাময়িকপত্রাদি দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত গীতি-কবিতা গ্রন্থ। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উচ্চশ্রেণীর। মূল্য—১৲ টাকা মাত্র। প্রকাশক—বাঙ্গালী বুক ডিপো, ১৬নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—বাঙ্গালী বুক ডিপো

১৬, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা,

এবং গ্রন্থকারের নিকট, শান্তিপুর (নদীয়া)